ইন এনিমি হ্যান্ডস

মৈনক ধর

ইন এনিমি হ্যান্ডস

মৈনক ধর

রূপান্তর : জহিরুল হক অপি

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

ইন এনিমি হ্যান্ডস

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২০
প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক

আমাদেরবই ডট কম

২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক

www.amaderboi.com/projonmo
www.rokomari.com/publisher/8485

মূল্য : 100 [একশত] টাকা

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

In Enemy Hands by Mainak Dhar
Published by Projonmo Publication
Price : 100 Taka
International Price : $ 6.00 USD
ISBN : 978-984-94636-5-8

প্রতিশোধ

সোপোর, কাশ্মীর

জলের ফোঁটা মুখের ওপর পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। পরক্ষণে মনে হলো, বৃষ্টি পড়ছে। নোনতা স্বাদ জানান দিলো- বৃষ্টি নয়; রক্তের ফোঁটা পড়ছে আমার মুখে!

চোখ খুলে নিজেকে সামলে নেওয়ার পর বুঝতে পারলাম, পাশের যে ভাঙাচুরা গাড়িটার সাথে হেলান দিয়ে শুয়ে আছি আমি, তার ওপরে থাকা লাশের গা বেয়ে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। কানে অপ্রীতিকর শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন বধির হয়ে গেছি। গলা শুকিয়ে গেছে। উঠতে গিয়ে ধকল সইতে হলো। গুলিবিদ্ধ হয়েছে আমার বাম পা। সেখান থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। ব্যথায় অবশ হয়ে যাচ্ছি দ্রুত। ফের মাটিতে শুয়ে পড়লাম। চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো ঠোঁটে। মুখে লেগে থাকা রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে অশ্রু। উভয়ের সাথে যন্ত্রণার বেশ মিল।

ব্যর্থ হয়েছি আমি। সহকর্মীরা বিলিয়ে দিয়েছে তাদের জীবন। ব্যর্থতা আর সহকর্মী হারানোর নিস্তব্ধ যাতনায় প্রতিনিয়ত জর্জরিত হওয়ার জন্য বেঁচে গেছি আমি।

গাড়ির ভাঙা জানালা আঁকড়ে ধরে কোনোমতে উঠে বসলাম। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর দুর্বলতা নিয়ে ভীত দৃষ্টিতে ধীরেধীরে তাকালাম চারদিকে। আমার তিন সহযোদ্ধার লাশ পড়ে আছে। চাঁদের আলোয় খুব অল্পই দেখা যায়। চাঁদকে আজ অপদার্থ মনে হলো। আমার মাথার ওপরে গাড়িতে পড়ে আছে থাপার প্রাণহীন নিথর দেহ। আমাকে বাঁচানোর জন্য ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়ার পর মরতে হয়েছে তাকে।

কয়েক ফুট দূরেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জয়দেব। প্রথম বোমা বিস্ফোরণের পর উড়ে গিয়ে এভাবেই পড়েছিল সে। বেচারা আর একটুও নড়ার সুযোগ পায়নি। যেন হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেছে। ড্রাইভার জয় সিংয়ের মাথা কাত হয়ে পড়ে আছে স্টিয়ারিংয়ের ওপর। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে যেন। সে ঘুম কে ভাঙাবে আর!

ও ঈশ্বর! বুক থেকে এক চাপা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো। কেউ যদি জানতো, তা কত উত্তপ্ত! কত শীতল।

বাঁ পায়ে ভীষণ ব্যথা। তিনটে গুলি বিঁধেছে এ পায়ে। গ্রেনেডের অনেকগুলো টুকরো এসে পড়েছিল আমার পাশে। তার একটি ভালোভাবে বিঁধে আছে আমার পায়ে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্যারা স্পেশাল ফোর্সে আট বছর

ধরে চাকরি করার পর এসব ধ্বংসযজ্ঞে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু মানুষ অনুভূতির ওপরে উঠতে পারে না বলে ব্যথা যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। পায়ের আহত জায়গার দিকে তাকাতেই ঠিক হাঁটুর উপর শক্ত আর সাদা কিছু একটা নজরে পড়ল। ভয়ে গা ছমছম করে উঠল, যখন বুঝতে পারলাম, সাদা অংশটি আমার নিজের হাঁড়। যন্ত্রণার উদ্রেক হলো পিঠেও। যেন একশোর বেশি ধারালো কাচের টুকরো বিঁধে আছে। পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকা রক্তের ফোঁটা আমাকে জানান দিতে থাকল, দেরিতে হলেও নিশ্চিতভাবে প্রাণ হারাতে চলেছি আমি। সেনাবাহিনীর হয়ে সেবা করে একটি বিষয় বুঝতে পারলাম, কাজের জন্য আমার জীবন কতখানি ঝুঁকিতে থাকে। সেই চিরন্তন সত্য কথাটি মনে পড়ল– এই পৃথিবীতে প্রতিটি জীবই নশ্বর, মরণশীল। এই বিশ্বাসটা বড় নিশ্চিতভাবে অনুভব করছি এ মুহূর্তে। আজ অবধি কখনো এতটা একা, এতটা বিধ্বস্ত অনুভূত হয়নি আমার। চোখের সামনে নিজের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। আমার অবচেতন মন যেন বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে যাচ্ছে– আমি মরে যাচ্ছি। বাঁচতে হলে যে করেই হোক, এই ব্যথাকে মন থেকে সরাতে হবে।

হাত দিয়ে নিজের উরুতে আঘাত করলাম। শক্ত হও মেজর! তুমি ভীতু, আহত নাগরিকের মতো আচরণ করছো। তুমি তো সাধারণ কেউ নও। দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে এক থেকে চার পর্যন্ত গুণে শ্বাস ছাড়ো।

শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করলাম হাত মুষ্টিবদ্ধ করে। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে, যা ঘটেছে তা মন থেকে সরিয়ে ফেলা। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। সেটা আর পরিবর্তন করা যাবে না। কী করতে পারতাম তা না ভেবে নিরাপদ থাকার জন্য কী করতে হবে, সেকথা ভাবাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। আমার ভেতরে থাকা সৈনিক সত্ত্বা আমাকে এভাবেই আদেশ করতে থাকল। আক্ষেপ করার জন্য সময় মিলবে আরও। অবসরে বসে স্মৃতিচারণ করা যাবে এই দুঃস্বপ্ন। তবে এ মুহূর্তে আমাকে সব চিন্তা সরিয়ে ভাবতে হবে, আজ রাতটা টিকে থাকার জন্য করণীয় কী আমার। যদি কিনা আমি জীবিত অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরতে চাই।

পেছনে একটা কিছুর আওয়াজ শুনতে পেয়ে কাটা দিয়ে উঠল শরীর। ওদের গেরিলা আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছি। তবে ওরা কি আমাকে হত্যা করার জন্য ফিরে এলো? চারপাশে বেশ অন্ধকার। স্পষ্ট দেখার উপায় নেই।

কিন্তু যখন তুমি কাউকে হত্যা করার জন্য খুঁজে ফিরছো, তারা খুঁজছে তোমাকে; তখন অনুভূতি দিয়ে অন্ধকারেও দেখা যায়। আমি নিঃশ্বাস থামিয়ে মাথা থেকে যাবতীয় অশুভ চিন্তা দূর করে—কী শুনেছি, পাশে কী আছে—অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। বারুদ, দগ্ধ মাংস, পুড়ে যাওয়া গাছের গন্ধ এলো নাকে। রক্তের শীতল গন্ধ পেলাম। এ যেন মৃত্যুর আঁশটে গন্ধ। তবু, নড়াচড়ার আওয়াজ পেলাম না কোথাও। হয়তো ঝোঁপের পাশে কোনো বন্যপ্রাণী ছিল। সম্ভবত, কাঠবিড়ালি বেড়াতে অথবা আমার মৃত্যু দেখতে বেরিয়েছে। দেখতে চাইছে, কেমন ভয়ঙ্কর নির্দয় হতে পারে কিছু রক্তপিপাসু জন্তু—যারা নিজেদের মানুষ বলে দাবি করে থাকে।

হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম রাত গভীর হচ্ছে। কাটায় কাটায় ১১টা ৫৫। আমার মনে পড়ে, ১১টার দিকে জয়দেব বলছিল, বিদ্রোহীরা সারাদিনের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেলে সেও দ্রুত ক্যাম্পে গিয়ে একটা নাইট ক্যাপ পরবে। আমিও অপারেশন সংক্রান্ত নিরাপত্তার ঘোর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম। কদিন আগেই ভারত সরকার কাশ্মিরে আর্টিকেল ৩৭০ কার্যকর করেছে। অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমরা। সকলেই জানতাম,

সম্ভবত আরেকটি বৃহৎ সন্ত্রাসী হামলা হলেই পাকিস্তানের সাথে বড়সড়ো লড়াই শুরু হয়ে যাবে। ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট আমাদের পাকিস্তানের অধীনে থাকা কাশ্মিরের বিভিন্ন অংশে শেষ কয়েক সপ্তাহে স্থাপিত সন্ত্রাসী ক্যাম্পের ব্যাপারে সতর্ক করেছিল। কিন্তু আমরা যা করছিলাম তাকে আমাদের বস বলতেন, আক্রমণাত্মক টহল। যার অর্থ আমরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বিপদের পেছনে ঘুরে ফিরছি। সবগুলো দল কাছাকাছি অবস্থান করে, যাতে বিদ্রোহীদের খুঁজে পেলেই এনকাউন্টার করে ফেলতে পারি। আমরা যুদ্ধ করছি অদম্য খুনিদের সাথে, যারা আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য যেকোনো সীমা অতিক্রম করতে রাজি। এক্ষেত্রে ক্যাম্পে লুকিয়ে বসে শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা করতে থাকাটা বোকামী। যা থেকে জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমাদেরই লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। আমরা এটাই শিখেছি আর এটাই করছিলাম।

দুটি বড় লড়াইয়ে শত্রুদের আটক করে তাদের ঘাটি ধ্বংস করার পর, মোটামুটি শান্ত মাস কেটে গিয়েছিল কাশ্মীরে। নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা যোদ্ধাদের বিরক্ত করছিল। কারণ, আমি তাদের এমন জায়গায় যেতে

দিচ্ছিলাম না, যেখানে আমরা পূর্বে টহল দিইনি বা আমাদের ড্রোন সেখানে যায়নি। আমি শুধু তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দেওয়ার জন্যই এমন করছিলাম। কিন্তু দৃশ্যত আমি ব্যর্থ হয়েছি। সেটাই এখন বড় সত্য।

আমরা ঘোর অন্ধকার পথে এগিয়ে গিয়েছিলাম। যেখান থেকে কিছুক্ষণ আগেই হাঙ্গামা হওয়ার রিপোর্ট এসেছে। ব্যাকআপের জন্য কল করব কি না, ভাবছিলাম। তারপর মনে হলো, সন্ত্রাসবাদীরা কিছুক্ষণ আগেই হামলা চালিয়েছে। আমাদের হাতে প্রাণ হারানোর ভয়ে এতক্ষণে পালিয়ে গেছে হয়তো।

পুঞ্চে পদাতিক অফিসার হিসেবে কর্মরত আমার ছোটো ভাই একমাস আগে প্রাণ হারিয়েছে স্নাইপার এ্যাটাকে। আমার অন্তরের একটি অংশ চাচ্ছিল, আজ রাতটা জঞ্জালহীন শান্ত একটা রাত হোক। ক্যাম্পে ফিরে ড্রিংক করার জন্য এক্সাইটেড ছিলাম সবাই। অন্তরের আরেকটি অংশ আচমকা হামলা করতে চাচ্ছিল যুদ্ধবাজদের ওপর, ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। আমাকে জানান দিচ্ছিল, যুদ্ধবাজদের সাথে যুদ্ধ করা শুধু সৈনিক হিসেবে আমার কাজ নয় বরং এই যুদ্ধটি ব্যক্তিগত। গত সপ্তাহে একটা বিল্ডিংয়ে ঢুকে ছুরি দিয়ে হত্যা করেছিলাম

শত্রুদের একজনকে। সহকর্মীরা আমাকে হিরো ভাবতো। আমার মেডেল পাওয়ার কথাও হচ্ছিল। যদিও মেডেল নিয়ে চিন্তা করি না আমি। আমি কখনোই হিরো খেতাব পাওয়া বা মেডেলের জন্য যুদ্ধ করিনি। শত্রুকে হত্যা করার সময় তার চেহারাটা দেখতে চাই শুধু। তাকে জানাতে চাই, কেন হত্যা করা হচ্ছে তাকে। আমার অন্তরের এই অংশটা ক্রুদ্ধ হয়ে আছে প্রতিহিংসার আগুনে।

ইনটেল জানিয়েছিল, জায়গাটিতে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা কম। তবে পুরো বনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। অথচ আমার অন্তরের ক্রুদ্ধ অংশই এই বন দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমার কমান্ডিং অফিসার বলেছিলেন, এই রাস্তা দিয়ে আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে উনার সমস্যা নেই। তবে উনি হলে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতেন।

সম্ভবত অন্য কোনো সময় বা পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীরা কোন এলাকায় আছে জানলে আমি অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে হামলায় যেতাম। আজকের মতো দলকে বিভক্ত করতাম না। ভাইয়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিলাম আমি। সেজন্যই একসাথে না থেকে দলকে বিভক্ত করেছিলাম। যাতে বেশি জায়গা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। যত বেশি এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে

থাকবে, সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করার সম্ভাবনাও বেশি থাকবে। এটাই ছিল পরিকল্পনা। অন্যান্য পরিকল্পনার মতো এটাতেও সফল হতে পারিনি আমরা।

কিছুক্ষণ আগে সবাই রিল্যাক্স করছিলাম কারণ ক্যাম্প থেকে মাত্র ৪৫ মিনিট দূরত্বে ছিলাম আমরা। কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল, রণক্ষেত্র থেকে ছুটি পেয়ে আমরা যদি হলিডে'র জন্য সময় পাই তাহলে কে কী করব। থাপা বলেছিল, গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েই দেবে এবার। জয়দেব তার ছোটো ছেলেটার সাথে খেলা করতে চায়। বছর পেরিয়ে গেল, ছেলেটাকে দেখেনি। জয় সিং তার বোনের বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলবে বলে জানালো। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, 'এই রক্ত নিয়ে খেলার চাকরিটা ছেড়ে দেবো আমি। একটা সুন্দর মেয়ে খুঁজে বিয়ে করে সুখের সংসার গড়ায় মন দেবো।'

হেসে দিলো তারা সবাই। আমার আড়ালে ওরা বলাবলি করছিল, আমি কখনোই প্রেম-বিয়ে-সংসার করতে পারব না। কারণ, আর্মির চাকরির সাথে বিয়ে হয়ে গেছে আমার। থাপা আমার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে বললো, আমি কখনোই এমন মেয়েকে খুঁজে পাবো না, যে আমার

কথা মতো চলতে পারবে। এই কথার অর্থ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আমার কাছে কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য মানে তাকে একশো পুশআপ করতে হবে। অন্ধকারে গ্লক আলাদা করে পুনরায় একত্রিত করতে হবে।

হেসে দিলাম আমরা সবাই। সহকর্মীদের সাথে এটাই আমার সর্বশেষ স্মৃতি। তারপর বামদিক থেকে আইইডি আসতে দেখে রাস্তার ডানদিকে গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে লাগলাম আমরা। তখনই বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। ওরা গুলি ছুঁড়লে থাপা নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো আমাকে। বাইরে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমার পাশের ট্যাভর এস্যাল্ট রাইফেলটা হাতে নিলাম। আক্রমণকারীরা ভাবছিল, লড়াই শেষ। কিন্তু আমি তাদের বোঝাতে চাচ্ছিলাম, আমাদের আক্রমণ করে ওরা কত বড় ভুল করেছে। রাইফেল হাতে নিয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগলাম আক্রমণকারীদের অবস্থান লক্ষ্য করে। একসময় বুলেট শেষ হয়ে গেল। আমি চারপাশে তাকিয়ে অতিরিক্ত ম্যাগাজিনগুলো কোথায় গিয়ে পড়েছে, তা খুঁজছিলাম। এসময় আরেকটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো।

তারপর শুধুই অন্ধকার। পুনরায় একটা জোড়ালো শব্দ শুনে বাস্তবে ফিরে এলাম। এই শব্দটা কি কোনো জন্তু বা

অন্যকিছুর? হামলার এক ঘণ্টা পরও তো বিদ্রোহীরা আর এখানে বসে থাকবে না। আমাকে হত্যা করার জন্য ওরা কাছে এলো না কেন? পাশে পিস্তলটা পড়ে থাকতে দেখে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম সেটির দিকে। শরীরের ব্যথাকে জয় করে স্পেয়ার ওয়ান বুলেটের জন্য কোমরের বেল্টের ক্লিপ হাতড়াতে লাগলাম। এটা যদি কোনো বন্যপ্রাণীর আওয়াজ হয়ে থাকে, তারপরও তাকে পিস্তলের শব্দে ভয় দেখাতে পারব। আর যদি বিদ্রোহীরা ফিরেই আসে, আমি লড়াইয়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাবো। যদিও পিস্তল হাতে নিয়ে আমি বুঝতে পারলাম, মাটিতে শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার সামর্থ্য নেই আমার।

আমার চারপাশে পড়ে আছে থাপার রক্ত। কিন্তু যখনই আমি নিজের শরীরের দিকে তাকালাম, তখন বুঝতে পারলাম, আমার সারা দেহ আবৃত করে দেওয়া স্যাঁতসেঁতে রক্ত শুধুই থাপার নয়, বরং অধিকাংশই আমার নিজের। আমি এখনো বুঝতে পারছি না, পিঠে কতটা ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু যতবারই আমি নড়ার চেষ্টা করছি, ব্যথায় আড়ষ্ট হচ্ছে পিঠ।

আমার পাশে কাপড়ের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে সেটা দিয়েই ব্যান্ডেজ করলাম বাম পায়ের ক্ষতের উপর। এটি আমার ভেতরের যন্ত্রণা কমাতে পারবে না। ঢেকে রাখবে পারবে না বেরিয়ে আসা হাড়টাকে। তবে নড়াচড়ার সাথে বেরোনো রক্ত নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। মাথা উঁচু করে গাড়ির রেডিওটা চলছে কি না, দেখার চেষ্টা করলাম। দুর্ভাগ্য! বিস্ফোরণে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে রেডিওটি। পকেট হাতড়ে মোবাইলটা পেলাম না। বিস্ফোরণের সময় কয়েক ফুট দূরে উড়ে গিয়ে পড়ায় ভেঙে গেছে মোবাইলের স্ক্রিন। ক্যাম্পে কল গেলে খুব বেশি সাহায্য পেয়ে যাবো, তা নয়। হয়তো তারা এখানে পৌঁছানোর আগেই আমি প্রাণ হারাব, যদি শত্রুরা আমাকে হত্যা করার জন্য আবার ফিরে আসে। কানে ঝিমঝিম করা বন্ধ হয়েছে। যাক! হতাশার মাঝেও আশার আলো আছে। সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাইনি আমি। আওয়াজটা আবারও কানে এলো। এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এটা কোনো মানুষের কণ্ঠ। কাশ্মীরি ভাষায় বিড়বিড় করছে কোনো এক মহিলা। কয়েক বছর ধরে কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর হয়ে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে থাকাবস্থায় অবসর সময় ব্যয় করেছি কাশ্মীরের ভাষা

শিখে। দুটি শব্দ উচ্চারণ করলাম আমি, 'মাদাথা করিভা।' অর্থাৎ, সাহায্য করুন।

সে কি এই গ্রামের বাসিন্দা? ক্রসফায়ারে ধরা পড়েছিল নাকি? আমি নিজেকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম। যখনই আমি হাঁটার জন্য বাম পায়ে বল প্রয়োগ করছি, যন্ত্রণা যেন বিষিয়ে দিচ্ছে ক্ষত। তাই আমি হামাগুড়ি দিয়েই আওয়াজের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমার বেল্টে থাকা টর্চটা এখনো কাজ করছে। রাস্তা পেরিয়ে পাশের গাছের সারির সামনে এসে টর্চ জ্বালিয়ে নজর বুলালাম চারদিকে। প্রথমেই কালো কাপড় পরা তিনজনকে দেখতে পেলাম। এস্যাল্ট রাইফেলগুলো পড়ে আছে তাদের পাশেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা আমাদের আক্রমণকারী শত্রু। আমার অন্তরের ক্রোধিত সত্ত্বা জেগে উঠল। এদের দেখে এই গ্রামের বাসিন্দা বলে মনে হলো, বর্ডার পেরিয়ে আসা কোনো যুদ্ধবাজ নয়। ওদের কাছে আরও বেশি অস্ত্র আছে- বুলেটপ্রুফ ইউনিফর্ম, আমেরিকান এম-ফোর রাইফেল। এসব তাদের পাকিস্তানি সহায়তাকারীদের দেওয়া উপহার। এই ছেলেগুলোর পাশে একে-৪৭ পড়ে আছে। কোনো বুলেট-প্রুফ ইউনিফর্ম নেই। ওদের শরীরে একাধিক গুলির চিহ্ন। একজনের মাথা

চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের পাশে একটি গ্রেনেড পড়ে থাকতে দেখলাম। এগুলোই কেড়ে নিয়েছে আমার সহকর্মীদের প্রাণ। আমি মুচকি হাসলাম। একটি কর্কশ আওয়াজ কানে এলো। আমি পুরোপুরি হেরে যাইনি। আমি যদি আজ মরেই যাই, কয়েকটা শত্রুর লাশও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব। আমি আবার মুচকি হাসলাম এই ভেবে, কেমন হয়, যদি আমি আর ওরা একসাথে নরকের দিকে পা বাড়াই! আমি আরেকবার শত্রুদের পাছায় লাথি দেওয়ার সুযোগ পাই।

তখনই আবার নারীকণ্ঠটা কানে এলো। আমি লাশগুলোর পাশ দিয়ে আরও কিছু জায়গা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে দেখলাম, গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা মেয়ে। রক্তে নেয়ে আছে সে। আমাকে দেখেই চোখ বড় হয়ে গেল। তার দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখতে পারলাম স্নিকার্স, জিন্স আর ধূসর টি-শার্ট পরে আছে সে। যা এখন রক্তাক্ত হয়ে আছে। দেখে কমবয়সীই মনে হচ্ছে। দুতিন বছর আগেই হয়তো কলেজের পাঠ চুকিয়েছে। তার পাশে যা পড়ে আছে, তা হয়তো কোনো এক সময় বেশ ফ্যাশনেবল ব্যাগ ছিল। যা বুলেটের আঘাতে ছিঁড়ে গেছে এখন। তার লম্বা চুল কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে। চোখদুটি

উজ্জ্বল নীল রঙয়ের। অন্য সময়ে চোখদুটো যেকোনো যুবকের হৃদয় কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখন ব্যথায় জর্জরিত হয়ে আছে তার চাহনি।

এখানে কী করছে সে? শত্রুদের মধ্যে বিদেশী যোদ্ধারা কেউ কেউ হামলার পর কাছের গ্রামগুলো থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় প্রায়ই। কিন্তু আমার পেছনের লাশগুলো দেখে এখানকারই মনে হয়েছে। তার কাছে এগিয়ে যেতেই পেছনে সরে গিয়ে কাশ্মীরি ভাষায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, 'আমাকে মারবেন না, প্লিজ।'

থেমে গেলাম আমি। আমার সারাদেহে রক্ত, হামাগুড়ি দিয়ে চলছি; গভীররাতে আমাকে দেখতে হয়তো রক্তখেকো পিশাচ মনে হচ্ছে। টর্চটা মাটিতে রেখে শার্টের হাতা দিয়ে মুখের রক্ত মুছলাম। আমি জানি না, এভাবে রক্ত মুছে আমার চেহারা দেখা যাচ্ছে কি না। তবে আশা করছি, ও বুঝতে পারবে আমি তার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি।

'প্লিজ, আমার কাছে আসবেন না।'

আমার দিকে টর্চের বাতি ফেললাম, যাতে সে চেহারা দেখতে পারে। কাশ্মীরি ভাষায় বললাম, 'শান্ত হোন। আমি আর্মি অফিসার। আপনার কোনো ক্ষতি করব না আমি।

তাছাড়া আমি নিজেই ভীষণভাবে আহত হয়ে আছি। আমার মনে হয় না, আমি কাউকে আঘাত করতে পারব।'

আমার দিকে ভালো করে তাকালো, কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে সে। তারপর থামলো মেয়েটা। যেন আরও কিছু বলার আগে ভাবছে, কী বলা উচিত। তারপর নির্ভুল ইংরেজিতে কথা বলে উঠল সে। আমি নিশ্চিত হলাম, সে স্টুডেন্ট বা উচ্চশিক্ষিতা। কোনো একভাবে সে এই ক্রসফায়ারের মুখে এসে পড়েছে।

'হ্যাঁ, আমার থেকেও আপনার অবস্থা বেশি নাজেহাল, মনে হচ্ছে।'

আমি মুচকি হাসলাম, হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। সে ভয় পেয়ে গাছের আড়ালে গেল।

'আশেপাশে কোনো গ্রাম আছে? আমরা কি কোনো ডাক্তার পেতে পারি?'

সে মাথা নেড়ে ডানদিকে দেখাল, 'আমার গ্রাম খুব একটা দূরে নয়। কিন্তু আহত হয়ে আছি আমি। আমার পা নড়ছেই না যেন। চেষ্টা করেছি। কিন্তু হাঁটতে পারছি না কোনোভাবে।'